নয়নাভিরাম কাপ্তাইয়ের জঙ্গলে

নিবিড় চৌধুরী

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, আমি আবার কাপ্তাই গেছি। কোনো ভোরে আচমকা ঘুরতে বেরিয়ে গেছি জঙ্গলে। অথবা বিকেলে শুয়ে আছি কাপ্তাইয়ের হেলিপ্যাডের পাহাড়ে। অথবা কর্ণফুলি নদীর পাড়ে হাঁটছি একা একা কিংবা বসে আছি সবুজ নরম ঘাসে। নদীর ওপারে দেখছি গাছে গাছে বানরদের লাফালাফি। এই বুঝি ছুটে গেল কোনো চিত্রা হরিণ। রামপাহাড়ের ওপরে শূকর ডাকছে না তো?

থাক থাক। ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসে না আমার স্মৃতিকথা লিখে না বসি! পাঠক বেজার হবেন। দোকানিদের কাছে ক্রেতারা যেমন লক্ষী তেমনি লেখকদের কাছে পাঠক। কিন্তু পাঠক, ভাবুন তো প্রতিটি লেখা কি নয় স্মৃতিকথা? হোক সেটা কবিতা বা গান কিংবা উপন্যাস? লেখক তো স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন। সেই লেখা কারও ভালো লাগে, কেউ ছুড়ে দেয় ডাস্টবিনে। এত কিছুর পরও আমি আজও কারও ভালো লাগার মতো লেখা লিখতে পারিনি। আফসোস। তারপরও আমার অবসর নেই। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের দুই মায়াস্ত্রো শার্ল ব্যোদলেয়ার ও ফিওদর দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি' নামের প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছিলেন, 'দিনের পর দিন। বিরাম নেই। ক্ষমা নেই, বিরাম নেই, নিষ্ঠুর। আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙা মাত্র, রাত একটা পেরিয়ে গেলেও থামে না।' পাঠক আমিও আপনাদের মন পেতে এমন বিরামহীন লিখেই যাচ্ছি। আপনি ভাবছেন, কী অদ্ভূত, ভ্রমণকাহিনীর নাম দিল 'কাপ্তাইয়ের জঙ্গলে' আর এখন লিখছে সাহিত্য! তবে বলি, ভ্রমণকাহিনীও সাহিত্যের অংশ। কোথায় যাবেন, কী করবেন, কী দেখবেন লিখলেই ভ্রমণকাহিনী হয় না বাপু। রবী ঠাকুরের জাপানযাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, য়্যুরোপ প্রবাসীর পত্র মূলত ভ্রমণসাহিত্য। কোথায় কীভাবে যাবেন ওসব গুগল করেও জানা যায়।

কিংবা ধরুণ, সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের উপন্যাস থেকে সত্যজিত রায়ের চিত্রায়ণে 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' ছবিটা? চার বন্ধু কীভাবে জঙ্গলে বেড়াতে গেলো জানার চেয়ে আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর হয়ে ধরা দেয় জঙ্গলে গিয়ে তারা কী করল, সেটা। সেই জঙ্গলে তারা প্রেমে পড়েছিল। আমিও কাপ্তাইয়ের জঙ্গলে ছুটে যেতাম ভালোবাসার টানে। সে টান যতটুকু না নারীর প্রতি তার চেয়ে বেশি ছিল নিঃসঙ্গতা উদযাপন আর সবুজের জন্য।

যেভাবে দিনকে দিন কলকারখানা হচ্ছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে, মানুষ না একদিন পুড়ে কয়লা হয়ে না যায়! নদ-নদী মারা যাচ্ছে, পশু-পাখির বৈচিত্র্য আগের মতো নেই। সবুজ কমে ক্রমে ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে পাহাড়। কাপ্তাইও আগে মতো গাছে ঢাকা নেই। এখন চারদিকে ঘরবাড়ি। ধানী জমিতে কলকারখানা। প্রকৃতিকে বাঁচাবে কে? ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা কী রেখে যাচ্ছি? তারা কি আমাদের ক্ষমা করবে?

প্রথমবার আমি কাপ্তাই গিয়েছিলাম খুব ছোটবেলায়। মায়ের সঙ্গে। সাম্পানে কর্ণফুলি পাড়ি দিয়ে গিয়েছিলাম চিৎমরম। রাঙামাটি জেলার একটি উপজেলা হলো কাপ্তাই। আর কাপ্তাইয়ের ইউনিয়ন চিৎমরম। মূল কাপ্তাইয়ে ঢোকার মুখে পড়বে চিৎমরমের ঘাট। সিঁড়িতে নেমে নদীতে করে মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর মেঘ সরে যাওয়ার মতো পরিস্কার হয়ে উঠবে চিৎমরম ইউনিয়নের ঘাট। সেই ঘাটে ইঞ্জিনচালিত নৌকার সারি। পাড়ে আদিবাসী মেয়েদের স্নান। ওদের দিকে অশুভ দৃষ্টিতে তাকাতে যাবেন না। মনে রাখবেন 'যস্মিন দেশে যদাচার'। মনে রাখবেন, আপনি এখন এসেছেন আদিবাসীদের এক গ্রামে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এবার আপনি ঘুরতে পারেন চাকমা-মারমাদের গ্রামে। ওরা খুবই সাধারণ। কারও ঘরে অনুমতি নিয়ে বসে একটু পাহাড়ের চোলাইকৃত কড়া দুচুয়ানিও খেয়ে নিতে পারেন। চিৎমরমের কারুকার্যমণ্ডিত বৌদ্ধ মন্দিরেও যেতে পারেন হৃদয়টা শান্ত করতে। আরেকটু ভেতরে হাঁটলে দেখবেন ছোট ছোট পাহাড়ে আদিবাসীদরে নিঃসঙ্গ ঘরবাড়ি। সেখানে শূকর আর মুরগি চরছে আনমনে। চারপাশে ধানী জমি। সন্ধ্যা নামলে বিশাল সেগুন বাগানকে পাশ কাটিয়ে ফিরতে ফিরতে মনে হবে লাতিন কথাসাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'নিঃসঙ্গতার শত বছর' উপন্যাসের মাকোন্দো গ্রামে ছিলেন এতক্ষণ।

দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে কাপ্তাই ভ্রমণ করতে হলে আপনাকে প্রথমে যেতে হবে চট্টগ্রাম। সেখানে তিন জায়গা থেকে আপনি কাপ্তাই যেতে পারবেন। বহদ্দারহাট মোড় বা বহদ্দারহাট বাস স্টেশন থেকে বাসে করে যেতে হলে আপনাকে প্রতি সিটের জন্য গুনতে হবে ১২০-১৩০ টাকা। লোকাল সিএনজি অটোরিকশাতে যেতে গেলে ১৫০ টাকা লাগতে পারে প্রতিজনের। চট্টগ্রামের অক্সিজেন থেকেও বাস বা সিএনজি অটোরিকশাতে কাপ্তাই যেতে পারবেন প্রায় একইরকম ভাড়ায়। সরাসরি কাপ্তাইয়ে ঢুকতে লাগতে পারে ঘণ্টা দুই সময়। তবে কিছু বাস লোকাল হয়ে চন্দ্রঘোনায় থামে। চট্টগ্রাম শহর, ফটিকছড়ি, হালদা নদী,

রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া পেরিয়ে কাপ্তাইয়ের মুখে চোখে পড়বে দুই পাশে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিশাল এক বিল। আর সামনে আপনার অপেক্ষায় আছে মেঘে ঢাকা এক পাহাড়।

কাপ্তাই গেলে কী কী দেখতে পাবেন? নাগরিক জীবনের ভিড়ে একটু স্বস্তির হাওয়া খেতে ঘুরে আসতে পারেন কাপ্তাই। কর্ণফুলির শাখা মিশেছে কাপ্তাই লেকে। এখানকার প্রকৃতি বেশ সবুজ। রয়েছে কিছু জাতীয় উদ্যান ও পিকনিক স্পট। তবে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হয় একটু নিরিবিলিতে। উঁচু আর ঘাসে চাওয়া পাহাড় মুহূর্তেই আপনার মন কেড়ে নেবে। এসব পাহাড়ের ছায়া এসে পড়েছে কর্ণফুলি নদীতে। যার কারণে এই নদীর জলকে মনে হবে সবুজ ও স্নিগ্ধ। কর্ণফুলি স্থানীয় মানুষের সুখে দুঃখের সঙ্গী। চট্টগ্রামের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শেফালি ঘোষের একটি গান শুনলেই মর্মটা বুঝতে সহজ হবে, 'ওরে কর্ণফুলিরে/সাক্ষী রাখিলাম তোরে/অভাগিনীর দুক্কের হতা/হইও বন্ধু রে...।' কর্ণফুলি নিয়ে আরেকটি স্থানীয় গানেরও কয়েক কলি তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না, 'কর্ণফুলির মাঝি/আঁই তোঁয়ার সাথে রাজি।'

কাপ্তাই হয়ে আপনি রাঙামাটি শহরেও যেতে পারেন। তবে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা হওয়ায় বাইক চালিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। একটু দেরি করে হলেও নিয়মিত কাপ্তাই থেকে রাঙামাটি বাস যায়। কাপ্তাই বাজারে নেমে প্রথমে ঘুরে আসতে পারেন সুইডিশ পলিটেকনিক্যাল। নাম শুনেই বুঝছেন এটি কাদের অর্থায়নে তৈরি। এই কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা সীমিত আর ক্যাম্পাস মনোমুগ্ধকর। কাপ্তাই বাজার বেশ বড়। বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী চাকমা, মারমাও ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি হওয়ায় রয়েছে খাবারের বৈচিত্র্যও। পাহাড়িদের খাবারের মধ্যে সহজলভ্য হলো শামুক, কাঁকড়া, বাঁশকোড়ল, শুঁটকি ও নাপ্পি। জুম চাষের বিভিন্ন ফসলও পাওয়া যায় কম দামে। রাত্রি যাপনের জন্য খুব একটা সুবিধা নেই এখানে। বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য বাজারে একটি কম দামি আবাসিক হোটেল অবশ্য আছে। নয়তো মিনিটে ২০ দূরে (সিএনজি অটোরিকশাতে) সেনা ক্যাম্পের আশেপাশে থাকার জন্য কিছু বাংলো পাবেন। তবে সেসব আগে থেকে বুকিং দিয়ে রাখতে হয়।

কাপ্তাই গেলে লেকের মাছ খাওয়াটা কখনো মিস করবেন না। এখানের মিঠা পানির সুস্বাদু মাছের সুনাম সুবিদৃত। স্থানীয় মানুষ মাছের জন্য লেকের ওপরেই নির্ভরশীল। কাপ্তাই বাজারের লেকের ঘাট থেকে নিয়মিত লঞ্চ ছাড়ে। লঞ্চে করে রাঙামাটির স্থানীয় লোকজন চলাচল করে। কেউ যায় বালুখালি, কেউ সদরে।

কাপ্তাইয়ের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ড্যাম দেখতে আপনাকে অবশ্য প্রজেক্টের ভেতরে যেতে হবে। তবে সেনাবাহিনীর পাস ছাড়া কিছুতেই ঢুকতে পারবেন না। প্রজেক্টের ভেতরে আত্মীয়স্বজন বা চেনা কেউ থাকলে তবেই মিলবে পাস। আর প্রজেক্টের ভেতরে ঢুকলে মনে হবে আপনি ইউরোপের কোনো দেশে এসেছেন। লেকের ওপর বিশাল ড্যামের রাস্তা। একটু ধুলাও পাবেন না। রাস্তার দুই পাশে ফুটে থাকা ঘাসফুলে শুয়েও পড়তেও পারেন। রাতের বেলা এখানের কলোনির মানুষ হাঁটতে বেরোয় এই রাস্তায়। বিদ্যুৎ যায় না বললেই চলে। যেদিন সংযোগ যায়, আগে থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেদিন রাতে ড্যামের রাস্তায় একটা ছোটখাটো মানুষের মেলাও বসে। জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসা আসামীদের মতো অনেকদিন পর আকাশ ও চাঁদ দেখার আনন্দে মেতে ওঠেন তারা। এতদিন পর কৃত্রিম আলো ছেড়ে রাতের প্রাকৃতিক আকাশ দেখার সুযোগটা কেউ হাতছাড়া করতে চান না। অবশ্য বছরে এমন দিন খুব কমই আসে।

ড্যামের পানি ছাড়লেও প্রজেক্ট ও তার আশেপাশে থাকা মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ও আনন্দ বিরাজ করে। একদিকে পানিতে ঘর প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা, অন্যদিকে লেকে মাছ ধরার দৃশ্য নিয়েই এখানের জীবন। ড্যামের ছবি তোলা নিষেধ। দেখলে একটু দূরে দাঁড়িয়েই দেখবেন। নয়তো দুর্ঘটনাবশত প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে পারেন। প্রজেক্টে ঢুকলে হ্যালিপেডে উঠতে পারেন আর ঢুকে পড়তে পারেন সংরক্ষিত জঙ্গলে। এই জঙ্গলে এখন খুব বেশি বন্যপ্রাণী নেই অবশ্য। তবে বেশি ভেতরে না যাওয়াই ভালো। আর প্রজেক্টে ঢুকতে না পারলেও বাইরে কর্ণফুলির ওপরে ভাসমান বাঁশের সারির ওপরে বসতে ভুলবেন না যেন।